Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 194–201
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' : দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবনের উপাখ্যান

ড. অন্তরা দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বেনারস
ই-মেইল : antaradas@bhu.ac.in

Keyword
ঋত্বিক ঘটক, 'দলিল', উদ্বাস্তু সমস্যা, দেশভাগ, ঋত্বিক ঘটকের নাটক, দেশভাগ ও সাহিত্য, বাংলা নাটক, নাট্যকার ঋত্বিক ঘটক, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাটক, বাংলা সাহিত্য ও উদ্বাস্তু সমস্যা

Abstract
ভারতবর্ষ প্রায় দুশো বছরের পরাধীনতার গ্লানিকে মুছে ১৯৪৭ সালের ১৫-ই আগষ্ট স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। তবে এই স্বাধীনতা পেতে গিয়ে ভারতবর্ষকে বিছিন্ন হতে হয়েছিল। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান (পূর্ব-পশ্চিম) এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে তবেই স্বাধীনতা পাওয়া গিয়েছিল। তাই স্বাধীনতা একদিকে যেমন মানুষকে আনন্দে উদ্বেলিত করে তুলেছিল, তেমনি অন্যদিকে অনিশ্চয়তায় উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। অনিশ্চয়তার প্রধান কারণ ছিন্নমূল হয়ে যাওয়া জীবনটাকে নিয়ে। একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের হিন্দু এবং হিন্দুস্তানের মুসলিমদের জীবনকে ঠেলে দিয়েছিল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। ছিন্নমূল এই মানুষগুলির তখন পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'উদ্বাস্তু'। উদ্বাস্তু জীবনের গ্লানি এবং সংগ্রাম বাংলা সাহিত্যেও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা এই দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যাকে দেখেছিলেন, ঋত্বিক ঘটক তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ঋত্বিক ঘটকের সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রে বার বার উঠে এসেছে দেশভাগ পরবর্তী সাধারণ মানুষের জীবন-সংগ্রামের উপাখ্যান। ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' নাটকের প্রেক্ষাপটে রয়েছে দেশভাগ। নাটক শুরু হয়েছে অখণ্ড বাংলাদেশের রূপাইকান্দি গ্রামে। মোট তিনটি প্রবাহে নাটকের আখ্যান শিয়ালদহ স্টেশনের অস্থায়ী জীবনের দিনগুলিকে সঙ্গে করে পাড়ি দিয়েছে শহরতলীর এক উদ্বাস্তু কলোনীতে। নাট্য-আখ্যান রূপাইকান্দির ক্ষেতু ঘোষের পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত হলেও আসলে এই পরিবারটি হয়ে উঠেছে অগণন পরিবারের প্রতিচ্ছবি।

Discussion
১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রে যখন ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ অপেক্ষা করছিল নতুন দিনের সূর্যোদয়ের, দুই-শতকের পরাধীনতার ক্লেদ আর গ্লানিকে জীবন থেকে ধুয়ে ফেলার জন্য জনগণ মেতে উঠেছিল আলোর উৎসবে, বাঁধনহীন হর্ষ আর উল্লাসে মুখর করে তুলছিল পরাধীনতার শেষ রজনীকে, তখন ভারতবর্ষের পশ্চিম আর পূর্ব সীমান্ত জুড়ে ঘন হয়ে উঠেছিল অনিশ্চয়তার কালো মেঘ। কেননা, 'ভারতীয় স্বাধীনতা অধিনিয়ম ১৯৪৭' অনুসারে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে। মুসলিম ও অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পাকিস্তান

(পূর্ব-পশ্চিম) আর হিন্দুস্তান বিভক্ত হয়েছিল রাজনৈতিক অভিসম্পাতে। পাকিস্তানের হিন্দু আর হিন্দুস্তানের মুসলিমদের জীবনে সহসা নেমে এসেছিল আগামীর অনিশ্চয়তা। নিজের সাত-পুরুষের ভিটেমাটিকে ছেড়ে মানুষ পাড়ি দিয়েছিল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। সীমানা টপকে আসতে হয়েছিল প্রাণের তাগিদে। অনেকে সত্যি সত্যি বাঁচতে পেরেছিল কাঙ্ক্ষিত আয়ুষ্কালের সবটুকু, কিন্তু কেমন ছিল সেই বেঁচে থাকা? কেমন ছিল সেই জীবন? তার আক্ষরিক ইতিহাস অবশ্য সংরক্ষিত হয়েছে অনেকখানি। কিছুটা হয়েছে খবরের পাতায়, কিছুটা সেনসাস রিপোর্টে, কিছুটা সরকারি দস্তাবেজে ও আরও কিছুটা ইতিহাস বইয়ের লিপিমালায়।

এই সমস্ত আক্ষরিক ইতিহাস আর তথ্যের অনেক গভীরে অধরা থেকে গেছে মানুষের দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের আখ্যান। যে সংগ্রাম শুধুমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ নয়, সেই সংগ্রাম ছড়িয়ে আছে নিজেদের 'উদ্বাস্তু' পরিচয় থেকে মুক্ত করে সসম্মানে জীবন-যাপন পর্যন্ত। সেই সংগ্রাম নিজেদের হারিয়ে যাওয়া অতীত আর ফেলে আসা সম্পর্কের উত্তাপকে সযত্নে আগলে রাখার সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম আগামীর জন্য সর্বদা নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখারও। ছিন্নমূল এই সমস্ত মানুষের একান্ত সংগ্রামের আখ্যান আমরা খুঁজে পেয়েছি সাহিত্যের ভুবনে। দেশভাগ আর ছিন্নমূল মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে গণনাতীত কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস এবং নাটক। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত ঋত্বিক কুমার ঘটকের রচিত 'দলিল' নাটকটিও তাদেরই একটি।

'দলিল' নাটকটি অনেকের মধ্যে একটি হয়েও অনন্য হয়ে ওঠার দাবি রাখে বেশ কিছু কারণে। তার মধ্যে প্রথম কারণটি হল সময়ের। ঋত্বিক ঘটক যে সময়ে এই নাটকটি রচনা এবং মঞ্চস্থ করেন সেই সময়ে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছিন্নমূল মানুষেরা জীবনের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছেন। ১৯৫২ সালের সেনসাস রিপোর্টে তার প্রমাণ মেলে:

> "The immediate suburbs of Calcutta, Barrackpur subdivision, Tollyganj, South Suburbs, Garden Reach and Bishnupur police stations contain the majori1y of the refugee population of 24-Parganas which is 527,262, and it is not unreasonable to assume that a great part of this population comes into Calcutta daily in search of a living and swells the city's trafic."[১]

ঠিক এইরকম সময়ে 'দলিল' নাটকটির উপস্থাপনা পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে প্রত্যক্ষ প্রভাব সৃষ্টি করার দাবি রেখেছিল। ছিন্নমূল মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে মানুষকে সহমর্মী হতে শিখিয়েছিল এই নাট্য ও নাটক।

'দলিল' নাটকটি অনন্য হয়ে ওঠার আরেকটি কারণ তার আঙ্গিক। নাট্যকার নাটকটিকে প্রথাগত অঙ্ক এবং পর্বে বিভক্ত না করে 'প্রবাহ' এবং অংশ'-এ বিভক্ত করেছেন। অঙ্ক-এর পরিবর্তে প্রবাহ-এর পরিকল্পনা শুধুমাত্র শব্দবিলাস নয়, নাটকের অভ্যন্তরে প্রবাহিত জীবন এবং নিরন্তর জীবন সংগ্রামের স্রোতটিকে বহু যত্নে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন নাট্যকার। 'প্রবাহ' শব্দটি তারই বাহক। নাট্যকার জানিয়েছেন—

> "সম্পূর্ণাঙ্গ নাটক বলতে যা বোঝায়, 'দলিল' একেবারেই তা নয়। পদ্মার স্রোতের মতোই বাস্তুচ্যুত বাঙালির ধারা চলেছে এগিয়ে এক অলঙ্ঘ্য পরিণতির দিকে। একদিকে রয়েছে চরম প্রতিকূল অবস্থা, আর একদিকে বলিষ্ঠ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, এই দুইয়ে মিলে আজকের বাস্তবকে সৃষ্টি করেছে। তারই ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে ঘটনা থেকে ঘটনায়, স্রোতের ঢেউয়ের মতো ছাপিয়ে ছাপিয়ে। তিনটি প্রবাহে সেই মূল সুরটিকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।"[২]

নাট্য-আখ্যানে এবং উপস্থাপনায় ঋত্বিক ঘটক সচেতনভাবে 'নাটকীয়তা'-কে বর্জন করেছেন। ছিন্নমূল মানুষের জীবনকে অনেকাংশে তথ্যচিত্রের মতো স্বাভাবিকভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন এই নাটকে ও নাট্যে। তিনি চেয়েছেন পাঠক এবং দর্শক অতিরঞ্জনহীন নিখাদ সত্যের মুখোমুখি হোক। এই সপক্ষে যুক্তি—

> "এ-নাটকের অভিনয়ে অনুভূতিটিই সব চেয়ে বেশি দামি। টেকনিকের দিকে না ঢুকে জীবনবোধের প্রতি ঝোঁক দিলে ভালো হয়। দৃশ্যগুলি নাটকীয় করে তুলতে অভিনয় যদি মঞ্চ-ঘেঁষা হয় তা হলে সর্বনাশ। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যের শেষ, ইচ্ছে করেই অত্যন্ত শান্ত একটা সুরে শেষ হচ্ছে। নাটুকে আবেগ ওখানে লাগলে নাটকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এ-নাটকে হৃদয়ের স্থান সর্বোচ্চ।"[৩]

নাট্যকার নাট্য-আখ্যানকে সমাপ্ত করেননি। তিনি মনে করেছেন এই আখ্যানের পরিণতি নেই। ছিন্নমূল সংগ্রামী মানুষ একদিন নিজেরাই এই আখ্যানের সমাপ্তি রচনা করবে। অর্থাৎ আখ্যানের নিরিখে এটিকে পূর্ণাঙ্গ বলার থেকে প্রবহমান বলাই সমীচীন। সময়ের নিরিখে নাট্য-আখ্যানের এই প্রবহমানতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক। সেই দিক থেকে 'দলিল' অনন্য।

সময়ের নিষ্ঠুর অভিশাপে উদ্বাস্তু জনগণের আখ্যান রচনা করতে গিয়ে ঋত্বিক ঘটক আশাহীন হয়ে পড়েন না। হাজারো বিপন্নতার মাঝে দাঁড়িয়ে নাট্যকার নিজের করকমলের আড়ালে আগলে রাখেন আশাদীপের শেষ শিখাটুকু। 'দলিল' নাটকটি অনন্য হয়ে ওঠার পিছনে এটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। মানুষের সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের উপরই ভরসা রাখেন নাট্যকার। জনগণের মিছিল একদিন নিজের অধিকার অর্জনে সফল হবেই, ভরসা রাখেন নাট্যকার। তিনি বলেন—

> "এ-নাটকের নায়ক জনতা একদিন তা (পরিণতি) আনবে। সেই ভবিষ্যৎ পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত আজকের প্রতিটি মিছিলে। তার আসার পথের প্রতিটি মোড়ের চিহ্ন নিয়েই 'দলিল', যে-দলিল আজও লেখা হচ্ছে। এর শেষ পাতাটি লিখবে জনতা, তার জন্যই সে-জায়গা আমি ছেড়ে গেলাম।"[৪]

হতাশার দিনে সম্ভাবনার কথা বলে 'দলিল'। অবসন্ন সময়েও জাগরণের গান শোনায় 'দলিল'।

এখন দেখা যাক 'দলিল' নাটকের তিনটি প্রবাহ জুড়ে সমসময়কে কীভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। নাটকের প্রথম প্রবাহের প্রেক্ষাপট অখণ্ড বাংলাদেশের রূপাইকান্দি গ্রাম। ক্ষেতু ঘোষ এই গ্রামের এক কৃষক। ক্ষেতু ঘোষের দুই ছেলে এক মেয়ে— মহিন্দর, গোপাল আর পদ্ম। মহিন্দর ক্ষেতু ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং বিবাহিত। স্বর্ণ, মহিন্দরের স্ত্রী এবং হারু তাদের একমাত্র পুত্র। হারুর বয়স বছর আট-দশ। পদ্ম, ক্ষেতু ঘোষের একমাত্র কন্যা এবং সন্তানদের মধ্যে কনিষ্ঠা। বয়স তেরো-চোদ্দ। এদেরকে নিয়েই পদ্মার তীরে সাধারণ মাটির বাড়িতে ক্ষেতুর ঘর-সংসার। বাংলার সাধারণ চাষী-পরিবার যেমন দৈনন্দিন অভাব আর আহ্লাদকে ঘিরে জীবনযাপন করে, ক্ষেতুর পরিবারটিও তাই। ফলে তারা আমাদের অচেনা মনে হয় না।

নাটকের শুরুতেই ক্ষেতুর কনিষ্ঠ পুত্র গোপালকে গান গাইতে দেখা যায়। গোপাল নিজে গান বাঁধে, নিজেই গায়। তার গানে পদ্মা নদীকে নিয়ে আবেগের গোপন কথাগুলি ফুটে ওঠে। তার গানের আবেশ সন্ধ্যার অন্ধকারকে যেন আরও আচ্ছন্ন করে দেয়। গোপাল গায়—

> "হামার জানের গাঙ রে, হামার সোনার গাঙ রে,
> হামার পদ্মা গাঙ।
> তুমিই হামার মন ভুলালে, তুমিই আমার প্রাণ
> — হো আমার গাঙ।
> যে টানেতে ভাসাও তুমি হামার ভাট্যাল নাও,
> গহিন রাতে যে ঢেউয়েতে পরান-কথা কও,
> তারাই হামার প্রাণ কাড়্যাছে, দিছে আকুল টান।
> — হো আমার গাঙ।"

'দলিল' নাটকের শুরু গোপালের এই গানটিকে দিয়ে। পদ্মা নদীকে নিয়ে গোপালের এই আবেগ ব্যক্তিগত নয়, পদ্মাকে ঘিরে বেড়ে ওঠা বাকিদেরও। স্বর্ণ, গোপালকে জিজ্ঞাসা করে কেনই বা এমন গান গাইছে গোপাল? সে কীসের চিন্তায় মত্ত? উত্তরে গোপাল জানায়—

> "গোপাল : আজ ক্যানে বা কুথাও যাবার মন করে না। ...ই কিনারাটাক বড়ো মনে ধর‍্যাছে আজ।" [৫]

গোপালের এই কথার মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় বিচ্ছেদের আভাস। গোপালরা তখনও জানে না, সম্ভাব্য বিচ্ছেদের যে খবরের কথা তারা একটু-আধটু শুনেছে তার পরিণতি কী হবে। তারা জানে না, সেই রাতেই দেশভাগের সিদ্ধান্ত রেডিওতে ঘোষণা করা হবে। গোপাল আর স্বর্ণ শুধু জানত তারা সে রাতে গ্রামের মেলাতে গম্ভীরা শুনতে যাবে। শেষ পর্যন্ত তাদের আর গম্ভীরা শুনতে যাওয়া হয় না। গ্রামের প্রাইমারি ইস্কুলের শিক্ষক হরেন ঘোষ জানিয়ে যায় দেশভাগের খবর—

> "হরেন : সি তো অনেক কথা বুলল। দু-পারে বারায়াছে খবরটা। কাঁঞা বিছানা গ্রহণ কর‍্যাছে। ...পাকিস্তান হয়্যা গিছে দেশ। ...ও, এই জেলাটা পাকিস্তানেই পড়্যাছে। হুই কিনার থিকা হিন্দুস্থান, ভারত রাষ্ট্র।"[৬]

দেশভাগের এই খবর প্রকাশিত হতেই সকলের মনে আশঙ্কার মেঘ ঘনিয়ে ওঠে। গোপালের প্রতিবেশি, গোপালের বন্ধু কলিম যেন সহসা বদলে যায়। সাম্প্রদায়িক কিরু শেখের উস্কানিতে সেও যোগ দেয়। দেশভাগের খবর শুনে কিরু শেখের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কলিমও "নারা এ তকবির— আল্লাহো আকবর" ধ্বনি দেয়। পারস্পরিক সম্প্রীতি অকস্মাৎ একটি খবরের আগমনে সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে।

প্রথম প্রবাহের দ্বিতীয় অংশে দেখা যায়, ক্ষেতুর পরিবারের গৃহত্যাগের প্রস্তুতি। একদিকে বিচ্ছেদের বিষাদ, অন্যদিকে হিন্দুস্তান-পাকিস্তানের প্রকট ভেদাভেদের আবহে প্রতিবেশী এবং হিতৈষী ফিরোজা নানির সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান বিবাদে জড়িয়ে পড়ে মহিন্দর। ফিরোজা, মহিন্দরের কথায় আর আচরণে দুঃখ পায়। স্বর্ণ, মহিন্দরের আচরণের জন্য প্রকারান্তরে ফিরোজার কাছে ক্ষমা চায়। ফিরোজাও পরিস্থিতির কথা বুঝতে পারে। তার মনে হয়, দেশভাগের এই সিদ্ধান্তের মধ্যে লুকিয়ে আছে কিছু মানুষের স্বার্থসিদ্ধি—

> "ফিরোজা— ...আমার মনটা বুলছে, বুঝলা ক্ষেতু, কোতি না কোতি কোনো লোকে লাভ করত্যাছে। কোনো লোকে লাভ করার মতলবেই দেশভাগ আর দেশান্তরী করার ঢেউটা লাগাছে।"[৭]

অবশেষে আসে চলে যাওয়ার পালা। পদ্মার পাড় ছেড়ে, নিজের ঘর, ঘরের উঠান ছেড়ে, ঝিঙে-মাচা, আলুর ক্ষেত, লেবু গাছ ছেড়ে, কলিম আর ফিরোজা নানিকে ছেড়ে, রূপাইকান্দি গ্রাম ছেড়ে, নিজের অতীত আর সুখ-দুঃখে বোনা ঘর-সংসার ছেড়ে, দিশাহীন অনাথের মতো ক্ষেতুর পরিবার বেরিয়ে পড়ে কলকাতার পথে। যে কলকাতা, তৎকালীন নতুন হিন্দুস্তানে।

নাটকের দ্বিতীয় প্রবাহের পটভূমি কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন চত্বর। ছিন্নমূল মানুষের ভিড়ে মুখরিত। বিছানা বিছিয়ে শুয়ে আছে অনেক অনেক মানুষ। ক্ষেতুর পরিবারও মিশে আছে তাদেরই ভিড়ে। প্রথম প্রবাহের শুরুতে শোনা গিয়েছিল গোপালের গান। যে গানে ছিল পদ্মা নদীর প্রতি গভীর প্রেমের উচ্চারণ। দ্বিতীয় প্রবাহের শুরুতেও গুনগুন করে গান শোনা যায় ক্ষেতুর কণ্ঠে। তবে এবারের গানে আর প্রেমের উত্তাপ নেই। আছে আক্ষেপ, আর আক্ষেপের সুরে জীবনের দর্শন—

> "কুন্‌বা রঙ্গে বাঁধ্যাছ ঘরখানা মিছা দুনিয়ার মাঝে রে বন্দি..."[৮]

নাটকের দ্বিতীয় প্রবাহে ক্ষেতুর পরিবার নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে আরও অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষের মতো হয়ে উঠেছে উদ্বাস্তু। আরও অনেকের মতোই নতুন এক জীবন সংগ্রামের স্রোতে সামিল হয়েছে তারা। স্বর্ণ নিজের গয়না বিক্রি করে পরিবারের পেট ভরাবার আপাত প্রয়াস করে। কিন্তু প্লাটফর্মের জীবন তার কাছে অসহ্য হতে থাকে—

> "এই দিবারাত্রির হাট আমি ছাড়ব, নয় গলায় দড়ি দিব।"[৯]

যে আব্রু বাংলার মহিলারা নিজেদের অলংকারের মতো আগলে রাখে, সেই আব্রু প্লাটফর্মের জীবনে রক্ষিত হয় না। স্নান করার জন্য কলের কাছে গিয়ে ফিরে আসে স্বর্ণ। পদ্মের উত্তরে স্বর্ণ বলে—

> "স্বর্ণ— কলপারে হাজার লোক চায়্যা আছে। গা ধুবার পথ নাই, মুখ দুবার পথ নাই, জল ভরার পথ নাই, — আবাগির বেটারা ডাব্যা ডাব্যা চোখে খালি তাক্যায়ে আছে, মুখানে নুড়া ধরাইয়া দিবার পারলে হামার জ্বালা জুড়ায়।"[১০]

এদের মধ্যে পদ্মের কাছে এই জীবন যত না আশঙ্কার, তার থেকেও বেশি রোমাঞ্চের। গাড়ি, আলো, বাজনা ইত্যাদি সব মিলিয়ে কলকাতা শহরটা তার ভালো লেগেছে। ছিন্নমূল মানুষের মিছিলে সে সামিল হয়। কলকাতার নতুন জনজীবনকে আবিষ্কার করতে চায় পদ্ম।

বিপরীতে ক্ষেতুর এই শহরটাকে একেবারে ভালো লাগে না, ক্ষেতুর মনে হয় এখানে নির্মল আকাশ পর্যন্ত নেই, আকাশের দিকে তাকালেও শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া দেখা যায়। মহিন্দরেরও আর ভালো লাগেনা প্লাটফর্মের জীবন। এক সময় হরেন পণ্ডিতের দেখা পায় তারা। তাদের অনেক আগেই হরেন পণ্ডিত এসেছিল এপারে। যাদবপুরে সে তৈরি করেছে একটা কলোনি। সেখানে একটা পাঠশালাও খুলেছে। হরেন বলে, তার কলোনির পাশে একটা ব্যারাকে ক্ষেতুদের থাকার ব্যাবস্থা করবে সে। সেই জায়গাটা ভালো না হলেও স্টেশনের জীবনের থেকে অন্তত ভালো হবে। হরেনের কথায় মহিন্দর কিছুটা আশ্বস্ত হয়।

এরই মধ্যে একদিন জনতার মিছিলে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। লাঠির আঘাতে রক্তাক্ত যুবকের মৃতদেহ দেখে ভয় পেয়ে যায় গোপাল। মিছিলে কাঁদানি গ্যাসের শেল ফাটে, গুলি চলে। মহিন্দর একই সঙ্গে ক্ষুব্ধ এবং দিশাহীন হয়ে পড়ে। পরিবারের কর্তা হয়েও পরিবারকে আশ্বস্ত করার কোনো উপায় খুঁজে পায় না ক্ষেতু। সরকারের কাছে আবেদন করতে চাওয়া অসহায় মানুষদের উপর নৃশংস অত্যাচার দেখে, গ্রামের সাধারণ কৃষিজীবি ক্ষেতুর মধ্যেও জেগে ওঠে প্রতিরোধের ভাবনা—

> "ক্ষেতু— ভিখ মাগ্যা মিলবে না হে। দেশ কাট্যা দু-ভাগ কর‍্যাছে যারা, তাদিগের কাছে ভিখ লয়। এই শিখল্যাম নতুন রাজত্বিত্।"[১১]

জীবনের অনিশ্চয়তা, অপমান, ক্ষোভ আর রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে নাটকের দ্বিতীয় প্রবাহের পটক্ষেপ হয়।

তৃতীয় প্রবাহে সময় অনেকখানি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কলকাতা সংলগ্ন কোনো এক রিফিউজি কলোনির পুরানো জীর্ণ ব্যারাকে দেখা যায় ক্ষেতুর পরিবারকে। দেবিন্দর এসেছে ক্ষেতুর কাছে। দেবেন্দিরের সঙ্গে ক্ষেতুর পরিচয় শিয়ালদার প্লাটফর্ম জীবনে। দেবেন্দির, গোপালের প্রায় সমবয়স্ক, ভাগচাষি। আরও অনেকের মতো সেও ওপার থেকে এপারে আসতে বাধ্য হয়েছিল। দেবেন্দির এখনো স্থিতু হতে পারেনি। এখানে পদ্ম আর দেবেন্দিরের কথোপকথনটি খুবই আবেগময়—

> "দেবেন্দির : ভাল... এট্টা কথা বুলবার আস্যাছিলাম—
> পদ্ম : কী?

দেবেন্দির : কাল রাতে শুনল্যাম উড়িষ্যায় নাকি জমি দিত্যাছে। উড়িষ্যাটা কোনদিক কও তো?
পদ্ম: দক্ষিণদিক
দেবেন্দির: সেই দিকেই চলল্যাম আমি। এখানে হামার দম আটকায়া আসে।
পদ্ম: কে বুলল জমি দেয়?
দেবেন্দির: যেই বলুক, আমি চল্যা যাব। কতকাল লাঙ্গলে হাত দেই নাই।"[১২]

ক্ষেতুর মতো ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষেরা বেঁচে থাকার জন্য একটুখানি আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করতে পারলেও, তাদের মনের ভিতরেও দেবেন্দিরের মতো একটা আকুতি সবসময় জাগ্রত থাকে। দেবেন্দিরের মতো তাদেরও মনে হয় 'কতকাল লাঙ্গলে হাত দেই নাই'। তাই দেবেন্দিরের সংলাপ এই পর্যায়ে শুধু আর দেবেন্দিরেরই থাকে না, তা হয়ে ওঠে ছিন্নমূল, কৃষিজীবি সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর। উড়িষ্যায় জমি বণ্টনের যে-প্রসঙ্গটি দেবেন্দিরের কথায় শোনা যায়, সেটি আসলে একটি সরকারি প্রকল্পকে ইঙ্গিত করে। সরকার উদ্বাস্তু মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য 'দণ্ডকারণ্য প্রকল্প' পরিকল্পনা করে ১৯৪৭ সালে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যখন 'দলিল' নাটকটি লেখা হয়, অর্থাৎ ১৯৫২ সাল, ততদিনেও প্রকল্পটি পরিকল্পনার স্তরেই থেকে যায়। 'দণ্ডকারণ্য প্রকল্প' রূপায়িত হয় ১৯৫৮ সালে।

তৃতীয়, অর্থাৎ শেষ প্রবাহে ক্ষেতুর পরিবারের অর্থনৈতিক সংকটের কথা বারে বারে উঠে আসে। ক্ষেতু তার নাতি হারুকে জীবিকার সন্ধান করতে বলে। হারুও জানায়, সে একটি চায়ের দোকানে বয়ের কাজের জন্য চেষ্টা করছে। স্বর্ণ নিজের সব গয়না পরিবারের খাবারের জোগান দেওয়ার জন্য বিক্রি করে দেয়। অতঃপর সে বাবুদের বাড়িতে ঝি-এর কাজের সন্ধান করে। কাজ জোটেনা তার। সে বুঝতে পারে কাজ করতে হলে নিজের ইজ্জত বিসর্জন দিতে হবে তাকে—

"পদ্ম: তুমার চাকরির কী হল?
স্বর্ণ: হবে না। ...ইজ্জত খোয়াবার পারবু?
পদ্ম: কী বুল না?
স্বর্ণ: অত চমক দিবার কিছু নাই। তাইলে অখনই চাকরি মিলে।
পদ্ম: ইস্ বউঠান।
স্বর্ণ: ছাওয়াল পাওয়াল— কী বুঝবা তুমি। ...ইজ্জত তোমাক্ খোয়াবার হবেই, কিন্তুক গরিমসি কর‍্যা এমন সময়েই খোয়াবা য্যাখন দেশসুদ্ধা ঘটি-বাঙ্গাল সব খোয়াইছে, ইজ্জত যখন সস্তা হওয়া গিছে।"[১৩]

অন্যদিকে জীবিকার সন্ধানে গোপালও দিশেহারা। হরেন মাস্টার গোপালকে পরামর্শ দেয়, নিজের বাঁধা নতুন গানগুলি বই হিসাবে ছাপিয়ে দু-আনা করে বিক্রি করতে। এই পরামর্শ গোপালের প্রথমে ভালো লাগে না। গোপাল বলে, গানের বই বিক্রি করলে নিজেকে ভিখারির মতো মনে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেটের জ্বালার কাছে পরাজিত হয় গোপাল। গোপাল হরেন মাস্টারকে বলে—

"গোপাল : খাড়াও। (হাত ধরে) আমার হেঁয়ালি নাই। খাঁটি কথা পেট। গুষ্টির গরাস তো জোগাড় করা লাগব। দেখ, সেই গানের পুস্তক ছাপ্যা দিবা বুল্যাছ,— বন্দোবস্ত কর, বেচব আমি।"[১৪]

মহিন্দরও জীবিকার সন্ধানে ঠিকামজুরের কাজ করতে যায়। সেখানে ধর্মঘটী মজুরদের পরিবর্তে ঠিকায় কাজের সুযোগ হয় তার। কিন্তু ধর্মঘটী পরিবারগুলির দিকে তাকিয়ে নিজের বিবেকের কাছে নত হতে পারে না সে। অপরের অন্নের ভাগ কেড়ে নিতে পারে না। তাই কাজ না করেই খালি হাতে ফিরে আসে। ক্ষেতুর পরিবারের এই অবস্থার দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি, সময়ের প্রবাহে দিন-রাত্রি অতিক্রম হলেও উদ্বাস্তু পরিবারগুলি নিজেদের সংকটকে অতিক্রম করতে পারে না।

তৃতীয় প্রবাহের দ্বিতীয় অংশে নাটকের আখ্যান, সংকটের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছায়। উদ্বাস্তু কলোনিতে দেখা দেয় মহামারী। প্রতিদিন দশ-বারোজন করে বাচ্চার মৃত্যুর খবর শোনা যায়। সৎকার করার অভাবে মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয় বনে-বাদাড়ে। শিয়ালে ছিঁড়ে নিয়ে যায় মৃত সন্তানের মাথা। স্বর্ণ আর মহিন্দরের সন্তান হারুও মহামারীর শিকার হয়। ডাক্তার এসে পৌঁছানোর আগেই মারা যায় হারু। এই মৃত্যু পুরো পরিবারটিকে বিধ্বস্ত করে দেয়। খারাপ সময় যেন অতিক্রান্ত হতে চায় না। রূপাইকান্দির ভিটেমাটি বিক্রি করার জন্য গোপাল কলিমকে চিঠি লিখেছিল অনেকদিন আগে। সেই চিঠির উত্তর আসে। কলিম জানায় সেখানকার পরিবেশ অশান্ত। তাই বিক্রির ব্যবস্থা করা যায়নি। অর্থপ্রাপ্তির শেষ আশাটুকু নিভে যায় গোপালের। তবে কলিমের চিঠিতে ফিরোজা নানির একটি কথা ক্ষেতুকে নতুন করে জাগিয়ে তোলে। ফিরোজা নানি বলেছিল লড়াই চালিয়ে যেতে। বলেছিল—

> "—বাংলারে কাটিছ কিন্তু দিলেরে কাটিবারে পার নাই।"[১৫]

তৃতীয় প্রবাহের দ্বিতীয় অংশেই 'দলিল' নাটকটি আপাতভাবে শেষ হয়। 'আপাতভাবে' বলার কারণ, পরিচালক নাটকের প্রস্তাবনা অংশেই জানিয়েছেন, এই নাটক তিনি শেষ করতে পারেননি, এর বুঝি শেষ নেই। এর শেষ পাতাটি লিখবে মহালেখক জনতা। নাটকের শেষে ক্ষেতুর চোখে হরেন মাস্টার দেখতে পায় প্রতিরোধের আগুন। ক্ষেতু ফিরোজা নানির চিঠি বুকে আঁকড়ে ধরে বলতে থাকে "বাংলারে কাটিছ কিন্তু দিলেরে কাটিবারে পার নাই"। আর নাটকের পটক্ষেপের অব্যবহিত পূর্বে মঞ্চের ওপর বারবার আছড়ে পড়ে জনতার কোলাহল। আমরা বুঝতে পারি নাটকের শেষ পাতাটি লেখার জন্য মহালেখক জনতা প্রস্তুত হচ্ছেন।

তিনটি প্রবাহ জুড়ে ক্ষেতুর পরিবারকে কেন্দ্র করে উদ্বাস্তু জীবনের যে চিত্রটি নাট্যকার ঋত্বিক ঘটক আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেন, তার মধ্য দিয়ে আমরা সমসময়ের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করতে পারি। দেশভাগের ফলে ক্ষেতুর মতো সাধারণ চাষী পরিবারের মানুষেরা শুধুমাত্র নিজের ভিটে-মাটিই হারায় না, হারিয়ে ফেলে নিজেদের সামাজিক সম্মানটুকুও। উদ্বাস্তু, শরণার্থী, রিফিউজি-র মতো শব্দের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে ক্ষেতুর মতো মানুষদের যুগ-যুগ ধরে আগলে রাখা আত্মমর্যাদাটুকুও। ক্ষেতু অনেক দুঃখ করে বলে—

> "ক্ষেতু : ...ইয়ারা বুলে রিফিউজি, শরণার্থী। আচ্ছা কও মান্‌ষেরে ডাক্যা যায় উহা বুইল্যা। এট্টা মান হামি কইর‍্যা রাইখ্যাছিলাম নিজের তরে, সেটা খোয়া গিছে। এখন চোরা চোরা লাগে। ...ক্যানে? কী কর‍্যাছি হামরা।"[১৬]

নাটকের শুরুতে আমরা দেখেছি ক্ষেতুর সুখের সংসারের দৃশ্য, সেই সংসারে ঘরের ছোট্ট ছেলেটি খুনসুটি করেছে তার পিসির কাছে, পিসি লেবু গাছের চারা এনে লাগিয়েছে অনেক যত্নে। বাড়ির অবিবাহিত যুবকটি বেঁধেছে গান, একমাত্র বধূটি স্নেহে-আদরে সকলকে বেঁধে রেখেছে। অথচ নাটকের শেষে বাড়ির সেই ছোট্ট ছেলেটিকে চায়ের দোকেনে বয়ের কাজের সন্ধান করতে হয়েছে। বাড়ির বধূটিকে নিজের গয়না বিক্রি করে সংসার চালাতে হয়েছে, কাজের সন্ধানে যেতে হয়েছে পরের দুয়ারে। যে-গান যুবক ছেলেটি বাঁধত মনের আনন্দে, সেই গান বিক্রি করে ভিখারির মতো জীবনকে বেছে নিতে হয়েছে। দেশভাগের অভিসম্পাতে হাজার হাজার পরিবার নিজেদের নির্মল জীবন হারিয়ে হয়ে উঠেছে আগাছা— উদ্বাস্তু।

'দলিল' নাটকটি ১৯৫৩ সালে গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় বোম্বে সম্মেলনে প্রথম পুরস্কার লাভ করে। দেশভাগের মতো একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নাট্যকার ঋত্বিক ঘটককে আজীবন পীড়িত করেছে। ছিন্নমূল হওয়ার যন্ত্রণা তিনি কোনোদিন ভুলতে পারেননি। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন—

> "...আমার সমস্ত বাংলাকে ভালোবাসার মূল হচ্ছে পূর্ব্ববাংলা। পরে নিজেদের ষোলোআনা সুবিধের জন্যে জোচ্চুরির দ্বারা যে দেশ ভাগ করা হল, তার ফলে আমার মতো প্রচুর বাঙালি শিকড় হারিয়েছে। এ দুঃখ ভোলার নয়। আমার শিল্প তারই ভিত্তিতে।"[১৭]

যে শিল্পীর শিল্পের মূলে রয়েছে দেশভাগ আর ছিন্নমূল মানুষের অবিস্মৃত দুঃখের স্রোত, একমাত্র সেই শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব উদ্বাস্তু জীবনের প্রতি সমমর্মী হয়ে নাটকের আখ্যানে সময়ের 'দলিল' রচনা করা।

তথ্যসূত্র :

১. Mitra A., Census of India 1951, VolumeVI, Part III, Calcutta City, Published By the Manager of Publication, 1954, Page. xi
২. চক্রবর্তী রথীন (সম্পাদিত ও সংকলিত), ঋত্বিক ঘটকের নাটকসংগ্রহ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, কলকাতা-২০, পৃ. ৬৫
৩. তদেব, পৃ. ৬৬
৪. তদেব, পৃ. ৬৯
৫. তদেব, পৃ. ৬৯
৬. তদেব, পৃ. ৭৮
৭. তদেব, পৃ. ৮০
৮. তদেব, পৃ. ৯১
৯. তদেব, পৃ. ৯৪
১০. তদেব, পৃ. ৯৪
১১. তদেব, পৃ. ১০০
১২. তদেব, পৃ. ১০২
১৩. তদেব, পৃ. ১০২
১৪. তদেব, পৃ. ১১৪
১৫. তদেব, পৃ. ১২১
১৬. তদেব, পৃ. ১০৪
১৭. ঘটক ঋত্বিককুমার, চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু, দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৪২

বিশেষ কৃতজ্ঞতা : ড. সুপ্রিয় কাঞ্জিলাল